নদিয়ার কৃষ্ণনগরে জন্ম হয়েছিল তাঁর। ব্রিটেনের প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ী অ্যাথলিট চার্লস জিমেলিন ১৯৫০ সালের এই দিনে প্রয়াত হন।

কিংবদন্তি ক্রিকেট তারকা বিজয় মার্চেন্টের জন্ম ১৯১১ সালের এই দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ২৫ আশ্বিন ১৪২৮
■ ৪২ বর্ষ ■ ১৪৬ সংখ্যা

উৎসবে সতর্কতা

দীর্ঘ করোনাকালের হতাশা ঝেড়ে শারদোৎসব এসে গিয়েছে। এই সময়কালে গত বছরের দুর্গাপুজো ছিল ম্লান। তার ওপর আদালতের নানা বিধিনিষেধে গত বছরের পুজোর বেশিরভাগ সময়টা ঘরে বসে কাটিয়েছেন অধিকাংশরা। এবার নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে অনেকেই বেরিয়ে পড়তে মরিয়া বলে মনে হচ্ছে। বোধনের আগেই বাংলার প্রত্যন্ত এলাকাতেও আছড়ে পড়ছে ভিড়। লকডাউনের কারণে আর্থিক সংকট থেকে এখনও পুরোপুরি রেহাই মেলেনি।

তা সত্ত্বেও পুজোর কেনাকাটায় ফের জৌলুস দেখা গিয়েছে। পুজো শুরু হয়ে গেলেও আধুনিক কেতায় শপিংয়ের বিরাম নেই। কার্যত পঞ্চমী থেকে দেখা গিয়েছে মহানন্দে প্যান্ডেল হপিং। পুজোর আগে করোনা বিধিনিষেধের নৈশ কার্ফিউ প্রত্যাহার করে নিয়েছে রাজ্য সরকার। ফলে গভীর রাতে অবাধ ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে অনেককে। আদালতও অনেক নিয়মকানুন শিথিল করেছে। সরকার ও আদালতের বেঁধে দেওয়া নিয়ম নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি থাকায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।

সেটা অবশ্য প্রশাসনিক ব্যাপার। কিন্তু চারপাশ দেখে মনে হচ্ছে, প্রায় দেড় বছর ঘরবন্দি থাকার পর মানুষ যেন এবারের দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রাণের আনন্দে মেতে উঠেছেন। উৎসব–পার্বণে সকলের মেতে ওঠা নিশ্চয়ই কাম্য। এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, পরিস্থিতি পুরোপুরি হুল্লোড়ের অনুকূল নয়। করোনা সংক্রমণের বিপদ এখনও পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়নি।

তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা চেপে বসে আছে ঘাড়ের ওপর। এই ঢেউয়ে বিশেষ করে শিশুরা সংক্রামিত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা অনেক আগে সতর্ক করেছিলেন। চিকিৎসকরা বলতে শুরু করেছেন যে, গত বছরের পুজোটা ছিল বয়স্কদের রক্ষা করার সময়, কিন্তু চলতি শারদোৎসব পুরোপুরি শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার কাল। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে আচমকা দৈনিক গড়ের চেয়ে শিশুমৃত্যু বেড়ে যাওয়াটা অশনিসংকেত নিশ্চয়ই। টিকার দুটি ডোজও যে করোনা ভাইরাসের হানা পুরোপুরি ঠেকাতে পারে না, তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত।

বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় উঠে আসছে, দুটি ডোজ নেওয়ার পর সংক্রামিত হলে তার প্রভাব তেমন মারাত্মক হয় না বলে অনেকে টের পান না। সাধারণ জ্বর ভেবে নিশ্চিন্তে থাকেন। তাতে তাঁদের সমস্যা না হলেও তাঁরা সংক্রমণ ছড়ানোর বাহক হয়ে ওঠেন। পুজোর ভিড়ে এমন বাহক কতজন আছেন, কেউ জানে না। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শপিং থেকে শুরু করে হপিং পর্যন্ত আবার যেন মাস্কহীন জীবনকে সবাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছেন।

অথচ বিশেষজ্ঞরা পইপই করে বলছেন, মাস্ককে আরও বেশ কয়েক বছর জীবনের অঙ্গ করে না রাখলে বিপদ থেকে মুক্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। উৎসবের আনন্দে আমরা অনেকে সেই সতর্কবার্তা ভুলেছি। কেউ সতর্ক করার চেষ্টা করলে উলটে চোটপাট করছি। ভাবটা যেন, এই মুহূর্তে করোনার বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে পৃথিবী।

আমরা ভুলে যেতে বসেছি, বিধিনিষেধ একেবারে উড়িয়ে দিলে আমরা নিজেদের চেয়েও আগামী প্রজন্মের বড় ক্ষতি করে বসতে পারি। শিশুদের করোনা চিকিৎসার পরিকাঠামোর এখনও অনেক ঘাটতি আছে। দেশের সমস্ত কোনায় শিশুদের চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থাটুকু নেই। আচমকা তাই করোনা সংক্রমণ ঝাঁপিয়ে পড়লে তা শিশুদের সুরক্ষার পক্ষে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে। অথচ শিশুদের বাঁচিয়ে রাখা শুধু রাষ্ট্র নয়, সাধারণ নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

এই শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়। তাই তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কর্তব্য পালনে আমাদের বিন্দুমাত্র ভুল হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে আগামী কয়েক প্রজন্মের ওপর। সত্যিই তা হলে, ভাবীকাল কিন্তু আমাদের ক্ষমা করবে না।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

অমৃতধারা

চতুর্দিকে অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসে, উদ্দেশ্য ততই নিকটবর্তী হয়, ততই জীবনের প্রকৃত অর্থ — জীবন যে স্বপ্ন, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, কেন যে মানুষ এটা বুঝতে পারে না, তাও বোঝা যায়– তারা যে কেবলই চেষ্টা করে এসেছে যা অর্থহীন তার মধ্যে থেকে অর্থ খুঁজে নিতে। ...‘সবই ক্ষণিক, সবই পরিবর্তনশীল’– এইটুকু নিশ্চয়ই জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ–দুঃখ ত্যাগ করে জগদ্বৈচিত্রের সাক্ষীমাত্ররূপে অবস্থান করেন, কোনও কিছুতে আসক্ত হন না। কেবল সংখ্যাধিক্য দিয়েই কোনও মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাকচাতুরী– এদের কোনওটারই বিশেষ কোনও মূল্য নেই। পবিত্র, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহাপ্রাণ লোকেরাই জগতে সব কাজ করে থাকেন।

–স্বামী বিবেকানন্দ

দেবীপক্ষ বিশেষ ৫ / বাঙালি গায়িকাদের অতীত–বর্তমান

মহিলা শিল্পীদের লড়াই আরও বেশি

রঞ্জন ভাদুড়ি

আরতি মুখোপাধ্যায়

লতাজির ‘লগ যা গলে’ গানটা আমি প্রায়ই শুনি। ওখানে ওই যে উনি গাইছেন, ‘লগ যা গলে এ এ এ...’ গলাটা মিলিয়ে যাওয়ার মধ্যেই ভায়োলিনের পার্ট ঢুকে যাচ্ছে। আহা, কী অপরূপ! এটা কি আলাদা আলাদা রেকর্ড করলে সম্ভব? এই জায়গাটায় কিন্তু আজকের শিল্পীরা অসহায়।

সে সময় এবং এ সময়ের গানের তুলনা করলে প্রযুক্তির দিক থেকে এই প্রজন্মের শিল্পীরা অনেক বেশি আশীর্বাদধন্য একথা সত্যি। তবে, ওই যে গান ও মিউজিক পার্ট আলাদা রেকর্ড করা হচ্ছে, অনেক সময় মিউজিক কম্পিউটারেই বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে বা অন্য কোনও জায়গা থেকে কপি করা হচ্ছে। এর ফলে গানটা হয়তো কোনওভাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমন্বয়সাধন হচ্ছে না।

যাঁরা সুরকার বা অ্যারেঞ্জার, তাঁদের একটাই অনুরোধ, প্রযুক্তি ব্যবহার করুন, কিন্তু গানের সৌন্দর্য নষ্ট না করে। আর অনুষ্ঠানের কথা যদি বলি, সামগ্রিকভাবেই আমাদের সময় যে হারে জলসা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত, তা কমতে কমতে এখন তলানিতে। এখনকার শিল্পীদের জন্য খারাপ লাগে। বিশেষ করে কোভিডের পর তো আরও।

এই সময় আমাদের আমলের পুজোর গানের কথা মনে পড়ে। একটা সময় পুজোর গান মানেই ছিল কত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কত পারিবারিক বন্ধন, কত বৈচিত্র্য।

পুজো এলেই ভীষণভাবে নস্টালজিক হয়ে পড়ি। একলহমায় পৌঁছে যাই সোনায় মোড়া দিনগুলিতে। কত যে স্মৃতি! গুরুদের কাছে বসে গান শেখা। কত গুণীজনের সান্নিধ্য! এক–একজন কিংবদন্তি গীতিকার–সুরকার, যন্ত্রশিল্পী। আমার প্রথম পুজোর গানের রেকর্ড বের হয় ১৯৬৫ সালে। তখন তো দু’পিঠে দুটি গান। ‘জানি এ ভুল’ আর ‘মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকো না’।

মনে পড়ছে, সে বছর প্রায় প্রতি পুজো প্যান্ডেলেই বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গে আমার গানদুটোও বাজছে শুনে কী যে আনন্দ পেয়েছিলাম! আমি তো তখন নিতান্তই এক ছোট মেয়ে। যদিও তার আগেই আমার আধুনিক গানের রেকর্ড বেরিয়ে গিয়েছে, যার সব গানই হিট। তবু, পুজোর গানের ব্যাপারটাই আলাদা।

পেশাদারিভাবে গানবাজনা করব, এমন ভাবনা অবশ্য স্বপ্নেও ছিল না। গান গাইতে ভীষণ ভালোবাসতাম। জাতীয়স্তরের এক মিউজিক কম্পিটিশনে ফার্স্ট হওয়ার পর এইচএমভি থেকে ডেকে নিয়ে গেল গাইবার জন্য। সেটাই শুরু। সেই সময় বাংলা গানের জগতের এক–একজন দিকপাল মানুষকে দেখেছি কাছ থেকে। একে অপরের প্রতি কী শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁরা! কাউকে কারও বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে শুনিনি। আমি চিন্ময় লাহিড়ী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সাগিরুদ্দিন খাঁ প্রমুখের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়েছি। জর্জদার কাছে রবীন্দ্রসংগীত। খুব মনে পড়ে জ্ঞানদা’র কথা। কী ভালো ভালো বন্দিশ দিতেন! তালিম, রেওয়াজ, চর্চা আর একটি সুন্দর শৈল্পিক পরিবেশ– এইসব নিয়েই তো এই দীর্ঘ পথে চলা। আজ যখন এর বিপরীত ছবিটা দেখি, বড্ড কষ্ট হয়।

পুজোর জলসা তো ছিলই। তখন সারাবছর ধরেই নানা অনুষ্ঠান হত। মনে পড়ে, আমরা কমবয়সিরা ব্যাক স্টেজে বসে বড়দের গান শুনতাম। জলসায় প্রথম গান গেয়ে ৩০ টাকা পেয়েছিলাম। পেয়েই একগাদা গানের রেকর্ড কিনে ফেললাম।

একটা কথা, আজকাল তো কত আয়োজন–মঞ্চ, সাউন্ড সিস্টেম থেকে শিল্পীদের সাজপোশাক। আমি কোনওদিন লিপস্টিক লাগাইনি। বড় জোর একটু কাজল আর টিপ। সাদা শাড়ি পরতাম বেশিরভাগ সময়। কিন্তু মানুষ গ্রহণ করেছেন বিপুলভাবে। তাঁরা গান শুনে এসে যে আশীর্বাদ করতেন, ভালোবাসা দিতেন, সেটাই আজও আমার পাথেয়।

এখানেই আলাদা করে বলব, নীতা সেন আর অসীমা মুখোপাধ্যায়ের কথা। নীতাদির সুরে ’বাবা তারকনাথ’ ছবির সব গানই এখনও লোকে শোনে। অসীমাদির সুরেও বেশ কিছু পরিচিত গান গেয়েছি সিনেমায়। আমি নিজেও আমার কিছু গানের সুর করেছি। পরবর্তীকালে মহিলা সুরকাররা সেভাবে কেন উঠে এলেন না, বলতে পারব না। হয়তো ভবিষ্যতে আসবেন।

আটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত প্রচলিত বাংলা আধুনিক গান একেবারে আলো করে ছিল আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গন। শিল্পীরা প্রত্যেকেই স্ববৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি গানের প্যাটার্ন আলাদা। সে এক নির্মল আনন্দের সময়। সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, প্রবীর মজুমদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের মতো কম্পোজার, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার–পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার মজাটাই ছিল আলাদা। আমি ভাগ্যবান। সন্ধ্যাদি, প্রতিমাদি, উৎপলাদি, আলপনাদি থেকে শুরু করে বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী– কত গায়িকা কাজ করেছেন দাপটে।

এখানেই আলাদা করে বলব, নীতা সেন আর অসীমা মুখোপাধ্যায়ের কথা। নীতাদির সুরে ’বাবা তারকনাথ’ ছবির সব গানই এখনও লোকে শোনে। অসীমাদির সুরেও বেশ কিছু পরিচিত গান গেয়েছি সিনেমায়। আমি নিজেও আমার কিছু গানের সুর করেছি। পরবর্তীকালে মহিলা সুরকাররা সেভাবে কেন উঠে এলেন না, বলতে পারব না। হয়তো ভবিষ্যতে আসবেন।

বাংলায় আমাদের পরের প্রজন্মের মহিলা শিল্পীদের অনেকেই বেশ প্রতিভার অধিকারী। প্রশিক্ষণও আছে তাদের। হৈমন্তী–অরুন্ধতীর পর লোপামুদ্রা তো খুবই ভালো গায়, রবীন্দ্রসংগীত এবং ওর নিজের গান। ওর মধ্যে একটা নিজস্বতা আছে। একটা বিশেষ ব্র্যান্ড তৈরি করেছে নিজের, ‘কবিতার গান’, তাতে চূড়ান্ত সাফল্যও পেয়েছে। অর্থাৎ শ্রোতারা গ্রহণ করেছে। একটাই কথা, গানের যে লিরিকাল ফর্ম্যাট সেটা অক্ষুণ্ণ থাকলে ভালো হয়। সব কবিতা গানে পরিণত করা যায় না। পরীক্ষানিরীক্ষার শেষকথা রবীন্দ্রনাথ। উনিও কিন্তু নিজের সব কবিতা সুরে বসাননি। শম্পা কুণ্ডু, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান ভালো লাগত। তারও পর শ্রেয়া ঘোষাল, কৌশিকী চক্রবর্তীরা খুবই ভালো গাইছে। দেশের এক নম্বর গায়িকা শ্রেয়া অনুষ্ঠানে প্রায়ই পুরোনো শিল্পীদের গান গায়। আমার মনে হয়, ওর নিজের গান আরও বেশি বেশি গাওয়া উচিত। কৌশিকী রাগসংগীতে খুব দক্ষ। ওটাই ওর ক্ষেত্র।

পরের প্রজন্মের শিল্পীদের একটাই কথা বলার। গান নিয়ে একটু পড়াশোনা, সঠিক তথ্য জানা, গানের কাব্যমূল্য বোঝা– এগুলো চর্চায় রাখলে তাদের গাওয়া গান আলাদা মাত্রা পাবে।

সব শিল্পীর জীবনে লড়াইটা থাকেই। মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়তো সেটা আর একটু বেশি। এ ব্যাপারে বিস্তারে না গিয়ে দু’একটি কথা বলব। মানুষের জীবন কোথাও সত্যি ভাগ্যের হাতের পুতুল। সুবীর হাজরাকে বিয়ে করার ভুল সিদ্ধান্তটাকেও সেভাবেই দেখি আমি।

একটা সময় প্রবল যন্ত্রণা ও বিপর্যয়ের মধ্যে কাটানোর ফলে, আমার সংগীত জীবন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই যখন তীব্রভাবে চলছে, তখনই সংগীত জগতেরও একটা চক্র অদ্ভুতভাবে চেষ্টা করল আমার গতি থামানোর।

১৯৮৩ সালের কথা। পঞ্চমদার সঙ্গে একটা কাজ করব, একদম ঠিকঠাক। কিছুদিন পর থেকে আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন উনি। ফোন করলে ফোন ধরেন না। এদিকে, আমি তো ওই কাজটার জন্যই বসে আছি। পরে শুনলাম আমাকে গাওয়াবেন বলে পঞ্চমদার বাড়িতে চূড়ান্ত অশান্তি চলছে। এই ঘটনা সলিল চৌধুরীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে! সব ঠিক হওয়ার পরেও এগোয়নি সেই প্রোজেক্ট।

বলতে দ্বিধা নেই, গানের জগৎ নষ্ট করেছেন কিছু বড়মাপের মানুষই। শিল্পীর যোগ্যতা বা প্রতিভা নয়, বড় হয়ে উঠল ব্যক্তিগত দুর্বলতা। এর ফলে গানের মান নেমে গেল। শ্রোতারা কেন গ্রহণ করবেন সেসব? মান নেমে যাওয়ার ফল অবশ্য আজ চূড়ান্তভাবে প্রকট!

একটি গান গেয়ে লোকজন রাতারাতি তারকা হয়ে যাচ্ছেন। কিছুদিন পরই হারিয়েও যাচ্ছেন। এই যে ডিজিটাল মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি অনেক বেশি শ্রোতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছি আমরা, এখানেও সেই মানরক্ষার দায়িত্ববোধ জরুরি। আসলে কেউ আর কিছু শিখতে চাইছে না। সবাই পারফর্ম করতে চাইছে। আমি কিন্তু আজও সেই শেখা ও চর্চার, গান নিয়ে ডুবে থাকার দিনগুলোতেই বেঁচে আছি। আগামীদিনেও এভাবেই থাকতে চাই আমার একান্তের গানের ভুবনে।

(অনুলিখন ঃ অজন্তা সিংহ)

মন্ত্রীদের পুজোয় এবারও কীসের এত জাঁকজমক?

বাঙালির সাম্প্রতিক পুজো

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাজ্যের নেতা–মন্ত্রীদের পাড়ার পুজো প্যান্ডেলের ছবি দেখে সাংঘাতিক স্বস্তি পাওয়া যায়! বিশেষত দেশের এই দুঃসময়ে। নেতারা এমনভাবে নিজস্ব পুজোয় মেতে, আলোয় ভরিয়ে দিয়েছেন মণ্ডপ, তাতে বাড়তি ভরসা উপচে পড়ে মনে।

যাক, মানুষের যাবতীয় যন্ত্রণার তাহলে শেষ। বড় সুখে রয়েছে মানুষ।

ঘাটালের দিকে বন্যার জল নেমে গিয়েছে আর বাঁধের ওপর রাত কাটাচ্ছে না নারী–পুরুষ। সুন্দরবনে আর নোনাজলে ভাসছে না কোনও গ্রাম। মেদিনীপুরে বানভাসি ফুলচাষিদের সমস্যার ইতি। মছলন্দপুরে নৌকোয় যাতায়াত করতে হচ্ছে না।

যাক, মানুষের রক্তক্ষরণের দিন একেবারে শেষ আপাতত। বাংলার হাসপাতালগুলোতে ভিড় নেই কোভিড রোগীদের। শিলিগুড়িতে আর রাত থেকে লাইন দিতে হচ্ছে না টিকা নিতে। উত্তরবঙ্গে হাসপাতালে অসুস্থ শিশুদের নিয়ে ভয়ার্ত মায়েদের ছুটোছুটি বন্ধ। এ বঙ্গের সমস্ত ছোট ব্যবসায়ীর মুখ আবার সোনালি হাসিতে উদ্ভাসিত। দেশজুড়ে কৃষকদের ক্ষোভ অস্তমিত।

আসলে তো এমন কিছু হয়নি। সবই নিছক ভ্রান্তি। সুন্দরবন বিপর্যস্ত কাঁদছে। ঘাটালেও ভেসে গিয়েছে অনেকের পুজোর আনন্দ। ম্লান মুখে ঘুরছে লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়ী ও তাঁদের পুত্রকন্যা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দেবাশিস কুমার, সুশান্ত ঘোষ, রতন দে–দের পুজোমণ্ডপ কলকাতা নগরীর সাম্প্রতিক পীঠস্থান বা বিজেপির শিশির বাজোরিয়া–প্রদীপ ঘোষের পুজো। আপনি বলবেন, নেতাদের পুজো বন্ধ করে লাভটা কী? তাতে অন্য মানুষের যন্ত্রণা কমবে? আমি বলি কি, পুজোর জন্য যে টাকাটা তোলেন, সেটা ঘাটাল বা সুন্দরবনের পরিকাঠামোর উন্নয়নে কাজে লাগানো যেত না? মন্ত্রী–নেতাদের দায়িত্ব বেশি। তাঁরা যদি স্রোতে গা না ভাসিয়ে, ‘বুর্জ খলিফা’ বা ‘বাংলাদেশ’ বন্ধ করে টিমটিম আলোয় পুজো সারতেন এবার, তাহলে গ্ল্যামার কমে যেত? কমত কমত। আপনারা শুধু প্রদীপের আলোয় পুজো সারলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করতে যেতেন। তারিফই করতেন।

বরিশাল
BARISAL
252'6 km
রিদপুর
IDPUR
218.5 km

উজবুকের মতো কয়েকটা বেয়াড়া প্রশ্ন কিলবিল করে মাথার ভিতরে। এঁরা যদি মন্ত্রী না হতেন, তাহলে কি লোকে এত টাকা দিত ওই পুজোকে? ক্ষমতা চলে গেলে কিছু মন্ত্রীর পুজো কী দাঁড়াবে? এই যে এত তারকা হাজির দাদা দাদা বলে, এঁরা মন্ত্রী না থাকলে আসতেন কখনও? তার মানে সব প্রাপ্তিই মন্ত্রিত্বের জোরে।

মন্ত্রীদের মধ্যে সুব্রতই উঠতি পুজো করিয়ে নন। সোমেন মিত্রের কালীপুজো যেমন বহুদিনের বিখ্যাত ছিল, সুব্রতর একডালিয়াও তাই। প্রেসিডেন্ট হিসেবেই এবার সুব্রতর সুবর্ণ জয়ন্তী। বাকিরা কিন্তু পুজোটাকে নিজস্ব প্রচার বাড়াতে ব্যবহার করেন। দু’–একজন আগেও পুজো করতেন, কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েছে বাহার। মন্ত্রী হওয়ার পর আরও জেল্লা। সেরা উদাহরণ পার্থর নাকতলা উদয়ন সংঘ। সাম্প্রতিকতম সংযোজন চন্দ্রিমার হিন্দুস্তান ক্লাব। কালীঘাট মিলন সংঘ– মুখ্যমন্ত্রীর ভাইদের পুজো বহু বছরের। গ্ল্যামার বেড়েছে ইদানীং এবং এঁরা প্রত্যেকেই ‘হাম কিসিসে কম নেহি’ ভাবনায় ব্যস্ত।

মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ বড় সংস্থাই নেতা–মন্ত্রীদের পুজোয় স্পনসর হয় ভয়ে। ভক্তিতে নয়। যে অঞ্চলে যত শপিং মল, যত দোকান, সেখানকার নেতাদের পুজোর তত রমরমা। চাঁদা বাঁধা। প্রোমোটাররাজ এখনও যেখানে সক্রিয়, সেখানকার নেতাদেরও চিন্তা নেই। কমিটিতে প্রেসিডেন্ট–ভাইস প্রেসিডেন্ট করে আনা শিল্পপতিদের কাছেও বিশাল অঙ্কের টাকা মেলে। একেবারে পুরোনো দিনের মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের ঢংয়ে।

গ্রামবাংলায় ছোটখাটো নেতাদের পুজো যে কী আকাশছোঁয়া বাজেটে পৌঁছায়, সেটা জানি না। তবে এমন উদাহরণ খুঁজলে মিলবে নিশ্চয়ই। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন...। তাছাড়া আজকের বাংলায় সব পার্টিতে কলকাতার দাদারাই সব শিক্ষক। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গীয় নেতারা এখানে নেহাতই শিশু।

নেতা–মন্ত্রীদের পুজো নিয়ে নিন্দুকে যা বলছে বলুক, তাতে কারও কিছুই এসে যায় না এখন। তবে বিনীত একটা প্রশ্ন থেকেই যায় কোভিড আবহে। জনপ্রতিনিধিরা যদি এভাবে জমজমাট ভিড়ের পুজো করে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের স্টাইলে গান ধরেন, ‘ওরে আয় আয় আয়, আমাদের ছুটি ছুটি, চল নেব লুটি’, তাহলে সাধারণ মানুষ তো ওদিকে দলে দলে ছুটবেনই। আমরা মুখে বলছি, কোভিডের তৃতীয় ঢেউ আসতে পারে, সাধু সাবধান, শিশুরা সামলে। বাস্তবে কী বার্তা মন্ত্রীমশাইরা রাখছেন বাংলার বাকি পুজোর কর্তাদের কাছে? অন্তত এবারের পুজোয় জাঁকজমক না করাটাই হত প্রকৃত জনপ্রতিনিধির কাজ।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

আলোচিত

উত্তরপ্রদেশে এত বড় ঘটনা ঘটল, কৃষক খুন হল, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও তাপউত্তাপ নেই। অথচ ২৩ বছর বয়সের এক তরুণকে ঝামেলায় ফেলা হচ্ছে শুধু তাঁর পদবি খান বলে। বিজেপি মুসলিমদেরই টার্গেট করছে।

–মেহবুবা মুফতি

আজ

১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের ক্ষমতা দখল করেন পারভেজ মোশারফ। শরিফকে গৃহবন্দি করা হয়। কার্গিল যুদ্ধের পর দুজনের মধ্যে বিরোধে শরিফ মোশারফকে সেনাপ্রধান থেকে সরানোর চেষ্টা করেন। প্রতিশোধে সেনা অভ্যুত্থান।

বিন্দু বিসর্গ

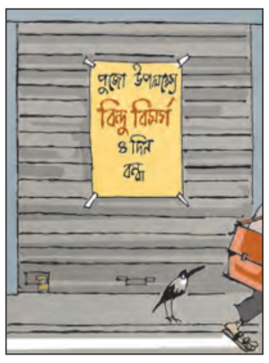

শব্দরঙ্গ ■ ৩০৪৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। দেবী কাত্যায়নী যে পর্বতে যুদ্ধের পর মহিষাসুরকে বধ করেন ৩। হিমালয়ের কন্যা হিসেবে দেবী দুর্গার পরিচয় ৫। ভীষণ দর্শনা দেবী মহাকালী ৬। খুবই দশাসই এবং শক্তিধর ৭। ওজনে খুব একটা ভারী নয় ৯। যে আদি শক্তি থেকে দেবীর সৃষ্টি হয়েছে ১২। কৃষ্ণের প্রেমিকা এক গৃহবধূ ১৩। গণেশ জননী হিসেবে দেবী দুর্গার নাম।

উপর–নীচ : ১। শখ–শৌখিনতা বা বাবুগিরি ২। অনেক তবলার সম্মিলিত বাদন ৩। মুসলিম মহিলাদের শরীর আচ্ছাদন করার আবরণ ৪। গোরুর খাদ্য হিসেবে কুচানো ও ভেজানো বিচালি ৫। দরজার আংটা অথবা রান্নার পাত্র ৭। দেবতাদের শিল্পী বিশ্বকর্মার বাহন ৮। দেবী দুর্গার ৬৪জন যোগিনীর মধ্যে অন্যতমা ৯। পাতলা নতুন খেজুর গুড় ১০। দেবী দুর্গার অষ্টশক্তি যে নামে পরিচিত ১১। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিষয় নয়, তৈরি করা বা নকল।

সমাধান ■ ৩০৪৩

পাশাপাশি : ১। অন্নদা ৪। বয়াম ৫। মিগ ৭। সীমানা ৮। মাস্টারদা ৯। লম্বোদর ১১। মক্কেল ১৩। কপি ১৪। বীথিকা ১৫। ইলিশ।

উপর–নীচ : ১। অতসী ২। দাবনা ৩। দমদমা ৬। গলদা ৯। লক্তক ১০। রক্তবীজ ১১। মকাই ১২। লঙ্কেশ।

জনমত

দেবী চৌধুরানি মন্দিরের সংস্কার

জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে শতাব্দীপ্রাচীন দেবী চৌধুরানি মন্দিরটি পার্শ্ববর্তী মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছেও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মন্দিরটি জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। কিন্তু মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলে যা চোখে পড়বে, তাতে একরকম হতাশ হতে হয়।

বিরাট জায়গা নিয়ে মন্দির অঞ্চলটি হলেও রক্ষণাবেক্ষণের কোনও চিহ্ন নেই। কালী মন্দিরটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছুটা সংস্কার করা হলেও সংলগ্ন অঞ্চলটি অত্যন্ত অযত্নে পড়ে রয়েছে।

জেলা প্রশাসন তথা রাজ্য প্রশাসন যদি উদ্যোগী হয়ে পরিকল্পনা করে মন্দির সংলগ্ন অঞ্চল সাজিয়ে তুলতে পারে, তাহলে ওই অঞ্চল পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ তৈরি হবে। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জ্যোতিপ্রসাদ রায়
উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

লাগামছাড়া দামে সংশয়

নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের খেয়েপরে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। লকডাউনে ছোট–বড় সব ব্যবসায়ীরই ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বাজারদর সবার জন্য সমান। সাধারণ মানুষ যাতে সাধারণভাবে খেয়েপরে বাঁচতে পারেন, সেজন্য প্রতিটি খাবারের দর বেঁধে দেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অরুণকুমার বিশ্বাস
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

মঞ্চে বক্তা, শ্রোতা নেই– এ কী সংস্কৃতি!

সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচয় তার ‘সংস্কৃতি’। সংস্কৃতি মানুষের সমাজজীবন, চিন্তা–চেতনা, আচার–আচরণ, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। ইদানীংকালে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণী চেয়ার আলো করে বসে রয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে মঞ্চের বিপরীত দিকে দর্শক সংখ্যা হাতেগোনা বললেই চলে।

কোভিড সময়কালে সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চা ভার্চুয়াল মাধ্যম এবং লেখালেখির মধ্যে আবদ্ধ। তবে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে। আঞ্চলিক সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থান ভেদে সুনির্দিষ্ট তথাকথিত গুণী মানুষ বা গোষ্ঠী বরাবর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে রাখে। অনেক ক্ষেত্রে নবীন সৃজনশীল প্রতিভাদের এই সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতে পরিচিতি, নিজের কাজের স্বীকৃতি পেতে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়তে হয়।

অন্যদিকে, তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি রক্ষাকারী, সংস্কৃতির ধ্বজাধারী গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা নিজেদের চেয়ার আগলে রাখতে ব্যস্ত থাকেন, মঞ্চে তাঁদের একটা পাকা চেয়ার চাই! এসব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে স্থান ভেদে পার্থক্য থাকতেই পারে। সব স্থানে একই রকম পরিবেশ নাও দেখা যেতে পারে।

সংকীর্ণ ও বৃহৎ অর্থে সংস্কৃতি চর্চার অবয়ব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে দেখা যেতে পারে। নেতিবাচক এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক সংস্কৃতি চর্চার ধারণাটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অপসংস্কৃতি ও অতি সংস্কৃতির মধ্যবর্তী স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

প্রবীণ সংস্কৃতিচর্চাকারী গুণীদের উপযুক্ত সম্মান বজায় রেখে সুপ্ত ও সদ্য বিকশিত নবীন প্রতিভাবানদের চিন্তা–চেতনা, শিল্পকর্ম, সৃজনশীল কাজকর্মকে উৎসাহ দেওয়ার সঙ্গে তাঁদেরও সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভারসাম্য সব স্তরেই বজায় রাখা দরকার।

সজল মজুমদার, বালুরঘাট।

পোস্ট অফিসের বেহাল ব্রাঞ্চ

বর্তমানে পোস্ট অফিসের অধীনস্থ ব্রাঞ্চ অফিসগুলি ধুঁকছে। অথচ ব্রাঞ্চ অফিসগুলিই গ্রামীণ মানুষের প্রধান অবলম্বন। এই ব্রাঞ্চগুলির বেশিরভাগেই কম্পিউটার তো দূর, ইলেক্ট্রিকও নেই। কোথাও কোথাও ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টারের অভাবে পিওনের দ্বারাই চলছে লেনদেন সংক্রান্ত কাজ। তাতে করে জনসাধারণের ভোগান্তির শেষ নেই। এখানে একজন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার পাঁচ হাজার টাকার বেশি তুলতে পারেন না, অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও।

আবার পাসবইটিও এন্ট্রির জন্য জমা রাখতে হয় একদিন বা দু’দিন। সত্যিই এরকম বেহাল অবস্থার শিকার গ্রামীণ মানুষজন। এর কি কোনও সুরাহা নেই!

শেখর দেবনাথ, গোবিন্দপুর,
কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর।